Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume –2, Issue-iii, published on July 2022, Page No. 216–223
Website: https://www.tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
e ISSN : 2583 – 0848 (Online)

জহির রায়হানের 'বরফ গলা নদী'তে নিম্ন-মধ্যবিত্তের সুখ-দুঃখের জীবনচিত্র

ওয়াহিদুজ্জামান রনি
গবেষক, বাংলা বিভাগ
বিশ্বভারতী
ই-মেইল : wahiduzzaman.dep@gmail.com

Keyword
জহির রায়হান, সমাজবাস্তবতা, আর্থিক টানাপোড়েন, সাংসারিক কর্মকাণ্ড, দায়িত্ব, পেশাগত সমস্যা, জীবনচিত্র

Abstract
কথাসাহিত্যিক জহির রায়হানের 'বরফ গলা নদী' উপন্যাসে সমাজের বাস্তবচিত্র ফুটে উঠেছে। নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষদের জীবন যন্ত্রণার চিত্র এতে প্রতিভাত হয়েছে। কেরানি হাসমত আলীর বৃহৎ সংসারের টানাপোড়েনের দুঃসহ জ্বালা এতে উপস্থাপিত হয়েছে। কম টাকায় ভাড়া বাড়িতে বসবাস করার কুফল, গৃহের আসবাবপত্রে জীর্ণতার ছাপ, অতিথি অ্যাপায়নে দরিদ্রতার দৃশ্য, টিউশনি করে দিন গুজরান ইত্যাদি চিত্র এতে সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে। সংসারের সুখ বজায় রাখতে মায়ের সদর্থক ভূমিকাও সদর্পে প্রতিভাত হয়েছে। রেস্তোঁরা শুধু খাবারের স্থান নয়, বেকারদের জন্য চাকরির বিজ্ঞাপনের খবর দিতে খবরের কাগজের যোগান এবং বিয়ের জন্য অবিবাহিতা মেয়েদের খোঁজ দিয়ে সমাজসেবার কাজ করে ম্যানেজার খোদাবক্স— তারও সুচারু বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। সত্য ঘটনা সংবাদপত্রের সম্পাদক প্রকাশ করতে না চাওয়ায় সৎ সাংবাদিকের কাজে ইস্তফা প্রদান লক্ষ্যণীয়। সংসারের দায়িত্ব পালনে পিতা, বড়ো পুত্র, বড়ো মেয়ের ভূমিকার কথা ব্যক্ত হয়েছে। ব্যবসায় ধারে কারবার দেখা গেলেও খদ্দের চটালে ব্যবসার ক্ষতি হয় বলে পাশ কাটিয়ে অন্য প্রসঙ্গের অবতারণা এতে উঠে এসেছে। গরিবের সংসারে বিয়ের খরচের চিন্তায় ব্যতিব্যস্ত, ব্যবসার প্রতিযোগিতায় টিকে না থাকার চিত্র, ক্যামেরায় ছবি না তুলতে চাওয়ার ধর্মীয় সংস্কার, বড়োলোক বরের গরিব শ্বশুরবাড়ির প্রতি ব্যবহার, সত্য ঘটনা গোপন না করায় নির্মমতার চিত্র, চাকরি করাকে গোলামি করার সমতুল দৃষ্টিতে দেখা— এতে বর্ণিত হয়েছে। আর্থিক দৈন্যতার ফলে একটি বৃহৎ পরিবারের দু-একজন ছাড়া নির্মমভাবে নিশ্চিহ্ন হবার দুঃসহ জীবনচিত্র এতে প্রস্ফুটিত হয়েছে।

Discussion
সাহিত্য সমাজের দর্পণ। জীবনের প্রতিফলন। 'সহিত' শব্দ থেকে 'সাহিত্য' শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে। ধাতুগত অর্থ ধরলে সাহিত্য শব্দের মধ্যে একটি মিলনের ভাব দেখতে পাওয়া যায়। সে যে কেবল, ভাবে-ভাবে ভাষায়-ভাষায় গ্রন্থে-গ্রন্থে

মিলন তাই-ই নয়, মানুষের সাথে মানুষের, অতীতের সাথে বর্তমানের, দূরের সাথে কাছের অত্যন্ত অন্তরঙ্গ যোগসাধন সাহিত্য ছাড়া আর কিছুর দ্বারা সম্ভব নয়। তাই সাহিত্য হচ্ছে মানুষের কল্পনা, অনুভুতি, ভাবনা, চেতনার বহিঃপ্রকাশ। মানুষের জীবনের নানান চিত্র উদ্ভাসিত হয় সাহিত্যে। মানুষ সমাজবদ্ধ জীব হওয়ায়, সমাজের বিচিত্র চিত্র সাহিত্যের কলেবরকে পরিপুষ্ট করে। তাই বলা যায়—

> "ব্যক্তি-মানুষ ও সমাজের অংশ বা সেই ব্যক্তি মানুষকে নিয়েই সমাজ। সে বিচারে ব্যক্তি ও সমাজ পরস্পর সম্বন্ধ সূত্রে জড়িত।"[১]

বাংলা সাহিত্য সৃষ্টির ঊষালগ্ন থেকে সমাজবাস্তবতার চিত্র দৃষ্ট হয়। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের আদি নিদর্শন চর্যাপদের পদগুলো থেকে তৎকালীন বাঙালি সমাজজীবনে আচার-আচরণ ও সমাজের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের নিখুঁত ছবি ফুটে ওঠে। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে ও সমাজবাস্তবতার বর্ণনা মেলে, যেমন— 'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপর নাই', 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে-ভাতে।' শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রাধা-কৃষ্ণ-বড়ায়ি এর চারিত্রিক ব্যবহার যেমন সে যুগের সমাজবাস্তবতার বার্তা বহন করে তেমন মঙ্গলকাব্যের চণ্ডীমঙ্গলের কালকেতু-ফুল্লরার মাধ্যমে তদানীন্তন সমাজব্যবস্থার স্বরূপ উদঘাটিত হয়। বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগেও সমাজবাস্তবতার রূপচিত্র রাজা রামমোহন রায় ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এর বিভিন্ন লেখায় উদ্ভাসিত হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্য প্রকরণ— উপন্যাসে সমাজ বাস্তবতার বাস্তবচিত্র রূপায়িত হয় সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সার্থক উপন্যাস সৃজনের মাধ্যমে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাসে সমাজের নানাবিধ অসঙ্গতির কথা দেখা যায়। সময় পরিবর্তনের সাথে সাথে সমকালীন সমাজের মানসচর্চা উপন্যাসে উপলব্ধ হয়।

১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে দেশভাগের পর ঔপন্যাসিকদের লেখনিতে বাস্তব ঘটনার রূপায়ণ হতে দেখা যায় ব্যাপকভাবে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, মন্বন্তর, ভাষা আন্দোলন, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দেশভাগ প্রভৃতিকে প্রেক্ষাপট করে সমাজবাস্তবতার নিপুণ চিত্র উপন্যাসে উদ্ভাসিত হতে থাকে। গ্রামীণ জীবনের কর্মকাণ্ড যেমন উপন্যাসের বিষয় হয়ে ওঠে, তেমন শহুরে জীবনের যান্ত্রিকতাও পরিস্ফুট হয়। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্, আবু ইসহাক, শওকত ওসমান, শহীদুল্লা কায়সার, আনোয়ার পাশা, আলাউদ্দিন আল আজাদ প্রমুখ-এর সমকালীন ঔপন্যাসিক জহির রায়হান (১৯৩৫-১৯৭২) বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক।

> "জহির রায়হানের বিচিত্র জীবন-সংঘাত ও আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামের মতোই তাঁর শিল্প বর্ণাঢ্য এবং বৈচিত্রে-ভরা।"[২]

তাঁর উপন্যাস সম্ভারের মধ্যে 'বরফ গলা নদী' (১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দ) একটি নান্দনিক সৃষ্টি। তিনি সমকালীন সমাজের সমস্যা এই উপন্যাসের মধ্যে ব্যক্ত করেছেন। এই উপন্যাস সম্পর্কে প্রণিধানযোগ্য—

> "অর্থনৈতিক কারণে বিপর্যস্ত ক্ষয়িষ্ণু মধ্যবিত্ত পরিবারের সামগ্রিক ভাঙনের শব্দচিত্র।"[৩]

ঔপন্যাসিকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও অনুশীলনে দেখা যায়—

> "বিষয় ভাবনার প্রতিফলন ধরা পড়েছে এই উপন্যাসে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় সমাজ কীরূপ হতে চলেছে এবং হওয়া উচিত তার সম্ভাব্য ইঙ্গিত দেন।"[৪]

জহির রায়হান ও তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিভিন্ন পেশাজীবী মানুষদের জীবন যন্ত্রণার ছবি প্রতিভাত করেন। এ প্রসঙ্গে বলা যায়—

> "প্রত্যেক ঘটনা এবং উপন্যাসে বিধৃত কাহিনী কোন একটি নির্দিষ্ট সময়-কাঠামোয় একটি প্রাকৃতিক-ভৌগোলিক-সামাজিক পরিবেশে রূপবদ্ধ হয়, চরিত্র-পাত্ররা ক্রম-বিকশিত হতে থাকে। নাটকে যেমন মঞ্চসজ্জার মাধ্যমে বাস্তব জগতের একটি অভ্যাস (Illusion) তৈরি করেন নাট্যকার ও পরিচালক, চলচ্চিত্রে

> যেমন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে location, উপন্যাসে তেমন কল্পনা শক্তি ও বর্ণনা শৈলীর দক্ষতায় লেখক নির্মাণ করেন পটভূমি ও পরিবেশ।"[৫]

ঔপন্যাসিকরা সমকালীন সমাজব্যবস্থার বাস্তবতার বিচিত্র চিত্র তুলে ধরেন—

> "এক সময় সমাজজীবন একটি স্থির প্রত্যয় বলয়িত হতো, জীবনের জটিলতা কম ছিলো বলে সমাজে স্বস্তি আর শান্তি ছিল বেশি; স্বভাবতই সেই সমাজকে প্রতিফলিত করতে গিয়ে তৎকালীন কথাসাহিত্যিককে সমাজের বহু দ্বার অতিক্রম করতে হতো না, কিংবা জীবনকে প্রশ্রয় দিতে গিয়ে জীবনের অন্ধগলি পেরোতে হতো না।"[৬]

কিন্তু সময় পরিবর্তনের সাথে সাথে সমাজের জীবনচর্যা ও মানসচর্চার রূপান্তর ঘটে। ফলে সমাজের বাস্তব চিত্রগুলি উপন্যাসের বিষয় হয়ে ওঠে। জহির রায়হান সুচারু বর্ণনায় নিপুণতার সাথে পেশায় কেরানি হাসমত আলীর সংসারের খুঁটিনাটি বিষয়গুলি তুলে ধরেছেন। স্ত্রী, সন্তানসহ পরিবারে সদস্য সংখ্যা সাত। সামান্য আয়ের সংসারে নুন আনতে পান্তা ফুরোয়। গলির ভিতরে কম ভাড়ায় ভাঙাচোরা বাড়িতে বৃহৎ পরিবার নিয়ে থাকে হাসমত আলী। যাদের পয়সা কম, তাদের জন্য রাস্তা চিরকাল ই কণ্টকপূর্ণ। যা উপন্যাসে পাই—

> "চারপাশে নোঙরা আবর্জনা ছড়ানো। কলার খোসা, মাছের আমিষ, মরা ইদুঁর, বাচ্চা ছেলেমেয়েদের পায়খানা, সব মিলেমিশে একাকার হয়ে আছে। দুর্গন্ধে এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকা যায় না।"[৭]

যাদের জীবন দুঃখে-কষ্টে ভরা তাদের জরা-জীর্ণ পরিবেশও আচ্ছন্ন করে রাখে। ঘরেও থাকে গাদাগাদি করে। ঔপন্যাসিকের ভাষায় পাই এভাবে—

> "দরাজাটা পেরুলে একটা সরু বারান্দা। দু'পাশে দুটো কামরা। ...বারান্দার শেষ প্রান্তে আরো একটি কামরা আছে। ওটাতে মা আর বাবা থাকেন। দুলু আর খোকনও থাকে ওখানে। ও ঘরটার পেছনে পাকাঘর আর কুয়োতলা। কুয়োতলায় যেতে হলে মা-বাবার কামরার ভেতর দিয়ে যেতে হয়। অন্য কোন পথ নেই।"[৮]

গৃহের আসবাব সরঞ্জামও জীর্ণতার ছায়াপাতে পরিপূর্ণ। চৌকিতে দুটি বালিশ, দেয়ালে ঝোলানো আলনা, কেরোসিন কাঠের টেবিল, মাদুর ইত্যাদি রয়েছে ঘরজুড়ে। এদের সংসারে নুন আনতে পান্তা ফুরোয়। বাড়িতে অতিথি এলে চা দিতেই হিমসিম খায়। গুণে গেঁথে দু'কাপ মতো চা হলে বিস্কুটের দেখা নাই। কেরানি হাসমত আলীর বড়ো মেয়ে মরিয়ম টিউশন পড়িয়ে নিজের পড়াশুনার খরচ জোগায়। মরিয়মের বান্ধবী লিলি, ওদের বাসায় এলে মরিয়মের বোন অষ্টম শ্রেণিতে পড়া হাসিনার উৎসুক মন নানান প্রশ্নবাণে তাকে জর্জরিত করে। উচ্চাকাঙ্ক্ষা উচ্চস্তরে পৌঁছতে পারে না দরিদ্রতার দ্যোতনার জন্যে। লিলির প্রতি হাসিনার প্রশ্নগুলি ছিল তীর্যকপূর্ণ। যেমন— শাড়ির দাম কতো, কোথা থেকে কিনেছেন ইত্যাদি।

মরিয়মের বান্ধবী আসলে আপ্যায়িত হয় মিষ্টি দ্বারা অথচ হাসিনার বান্ধবী এলে চা-ও জোটে না। বড়ো আক্ষেপ হাসিনার। এদের জীবন যন্ত্রণার কথা বলতে গিয়ে ঔপন্যাসিক বর্ণনা করেছেন এভাবে—

> "শহরে সন্ধ্যা নামার অনেক আগে এখানে অন্ধকার ঘনিয়ে আসে। বাইরে যখন বিকেল এ গলিতে তখন রাত। আর বাইরে যখন ভোর হয় তখনো এ গলিতে তমসায় ঢাকা থাকে।"[৯]

মরিয়ম রোজ পায়ে হেঁটে ছাত্রীর বাড়ি টিউশন পড়াতে যায় আবার পায়ে হেঁটে ফিরে আসে। রিক্সায় যাওয়া-আসা করলে যা পায় তার অর্ধেকটা ব্যয় হয়ে যায়। তাই পয়সা বাঁচাতে পরিশ্রম করে হেঁটে হেঁটে উদ্দেশ্য হাসিল করতে হয়। লেখকের ভাষায় যার সন্ধান মেলে এভাবে—

> "মাসের শেষে ত্রিশটা টাকা পাওয়ায় আনন্দ হাঁটার ক্লান্তির চেয়ে অনেক বেশি অনেক সুখপ্রদ।"[১০]

কেরানি হাসমত আলীর বড়ো ছেলে মাহমুদ সাংবাদিকতার কাজ করে সামান্য বেতনে। বড়ো সাংবাদিক হওয়ার স্বপ্ন তার চোখে। সে যা বেতন পায় তা বোনদের মুখে হাসি ফোটাতে কিছুটা হলেও ব্যয় করে। চুলের ফিতা আর মাথার কাঁটা কিনে এনে বোনেদের খুশি করতে চেষ্টা করে। বড়ো ভাই হিসেবে দায়িত্ব আছে বলে বোনেদের মনে করিয়ে দেয় এভাবে—

> "তোমাদের প্রতি আমার একটা বিশেষ দায়িত্ব আছে।"[১১]

প্রধান সম্পাদক দশ টাকা বেতন বাড়াবে বলে কথা দেওয়ায়— বাড়তি দশ টাকা ভাই বোনদের জন্য খরচ করবে বলে সগর্বে ঘোষণা করে মাহমুদ।

রাত জেগে সংবাদপত্র অফিসে মাহমুদ কাজ করে তাই একটু বেলা করে ঘুম থেকে জাগে। মাহমুদের মা তাই রোজ সকালে মাহমুদকে কাজকর্মে বিশেষ করে বাজার করার কাজে পায় না। তাই তার মা সালেহা বিবি কিছুটা গম্ভীর স্বরে ছেলের প্রতি বিদ্রুপাত্মক ভাষা প্রয়োগ করে। রোজ বাজার করে এনে আর কতো খাওয়াবে? বুড়ো বয়সে তাকে কষ্ট দিতে ছেলের লজ্জা করে না বলে ধিক্কার দেয়। মাহমুদও কম যায় না। সে পরিবারের জন্য রাতের পর রাত জেগে কাজ করে, আহলাদে ঘুরে বেড়াই না বলে প্রত্যুত্তর দেয়। মা সালেহা বিবিও দমবার পাত্র নয়। সপাটে জবাব দেয়—

> "তুই সারারাত জেগে কাজ করিস আর বুড়োটা কি বসে খায়? সারা জীবনে হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খেটে রোজগার করে এনে খাইয়েছেন।"[১২]

'বিশ্রামাগার' নামক রেস্তোঁরার ম্যানেজার খোদাবক্স শুধু চা বিক্রি করে লাভের মুখ দেখে না, লাভ অর্থাৎ ভালোবাসা প্রদান করে বেকারদের জন্য চাকরির বিজ্ঞাপনের খবর দিতে খবরের কাগজ রাখে। তার রেস্তোঁরা হতে একশো হাত দূরে অবস্থিত মেয়েদের স্কুলের অবিবাহিতা মেয়েদের খোঁজ রাখে সে। কোন্ মেয়েদের বাবা বড়ো চাকরি করে আর কার বাবা কেরানি সবই খোদাবক্সের নখদর্পণে। বিবাহযোগ্য পাত্রদের সে পাত্রীর খোঁজ দিয়ে সমাজসেবা করে।

সৎ সাংবাদিক হওয়ার স্বপ্নে বিভোর মাহমুদ ধাক্কা খায় সত্য ঘটনা সংবাদ পত্রে প্রকাশ না হওয়ার কারণে। একজন শিক্ষিত যুবক বেকারত্বের অভিশাপ থেকে মুক্তি পেতে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করে। কিন্তু খবরের কাগজের নিউজ এডিটর স্পেস নেই বলে অজুহাত দেখিয়ে খবরটি ছাপাতে রাজি হয়নি। সত্য এবং জীবনহানির মর্মন্তুদ ঘটনা মিথ্যা অজুহাত দেখিয়ে বাদ দেওয়ায় মাহমুদ ক্ষোভে দুঃখে সাংবাদিকতার কাজে ইস্তফা দেয়।

ভাড়া বাড়িতে নড়বড়ে ছাদে হাসিনা রোজ বিকেলে খেলা করে। তার মা শতবার নিষেধ করলেও সে বাধা মানতে চায় না। পোয়াখানেক ওজনের একটি ইট, ছাদ থেকে খসে পড়ে তার মা সালেহা বিবির মাথার উপর। রক্ত জমাট বাঁধে। হাসিনার বাবা হাসমত আলী আয়োডিন দিয়ে ব্যাণ্ডেজ করে দিয়েছে। রাগের মাথায় তিনি হাসিনাকে খুব মেরেছেন। যখন বাসায় ফিরলো মরিয়ম টিউশনি থেকে, কান্নার রোল তখনও শোনা যাচ্ছে হাসিনার। রান্নার ব্যবস্থা হয়নি রাতে খাওয়ার জন্য। বাড়ির বড়ো মেয়ে হিসেবে দায়িত্ব এসে পড়ে মরিয়মের উপর। রান্না ঘরে গিয়ে একটি তরকারি ও দুটো ভাত রান্না করে নামাতে তার বেশ রাত হয়ে গেলো। ঘুম থেকে তুলে ছোটো বোন দুলুকে নিজ হাতে খাইয়ে দিলো সে। ছোটো ভাই খোকনকেও খাওয়ালো। কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়া হাসিনাকে জাগিয়ে মরিয়ম ভাত খাওয়ার কথা বললে— সে তো খেতে রাজি হয় না, উপরন্তু মরিয়মের হাত কামড়ে দেয়। বাবা হাসমত আলীও খিদে নেই বলে এড়িয়ে যায়। সবাই না খেয়ে ঘুমাবে আর মরিয়ম খাবে সে কি হয়? সেও দু' গ্লাস জল পান করে ভাত না খেয়ে ঘুমাবার জন্য নিজের ঘরে চলে যায়। সবার দুঃখে সমব্যথী হয়ে নিজে রান্না-বান্না করেও অভুক্ত থাকলো, এটি বড়ো বোনের বড়ো ত্যাগের সার্থক দৃষ্টান্ত।

ছা-পোষা কেরানি হাসমত আলী জীবন সায়াহ্নে পৌঁছে জীবনের ক্ষণস্থায়ী মুহূর্তগুলো, টুকরো টুকরো ঘটনাগুলো স্মৃতি হয়ে দেখা দেয় মনে। বড়ো ছেলে মাহমুদকে ম্যাট্রিক পর্যন্ত পড়ানোর খরচ দিতে পেরেছে।

পরবর্তীতে সে গ্রাজুয়েট হলেও নিজে রোজগার করে পড়েছে।

> "নিম্নপদস্থ কেরানির পক্ষে ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখানো শুধু কষ্টসাধ্য নয়, দুরূহও বটে।"[১৩]

তাই মাহমুদকে কোন কারণে রাগাবার পক্ষপাতী তিনি নন। নিজের সন্তানের প্রতি তার বিরাট আস্থা। স্বভাবে উচ্ছৃঙ্খলতা দোষ থাকলেও সে বখাটে ছেলে নয়— একথা বিশ্বাস করে হাসমত আলী। তাছাড়া সে সংসারে প্রতিমাসে টাকা-পয়সা দিয়ে সাহায্য করে। তাছাড়া লেখাপড়া আর জানাশোনার দিক থেকে বাবার চেয়ে সে অনেক বড়ো।

> "তাছাড়া ছেলেমেয়েদের সকলের ভবিষ্যৎ ওর হাতে নির্ভর করছে। নিজে যে কোন সময় মারা যেতে পারেন সে জ্ঞান রাখেন হাসমত আলী।"[১৪]

আত্মবোধ সম্পন্ন মরিয়মের স্বপ্ন পূরণের ইচ্ছা থাকলেও সাধ্য ছিল না। মরিয়মের টিউশনের ছাত্রী সেলিনা। তার বড়ো বোনের দেবর মনসুরের সঙ্গে সেলিনাদের বাড়িতে পরিচয় হয়। অতিথি হয়ে মনসুর কোনোদিন তাদের বাড়ি এলে কিছু না হোক এক কাপ চা তো দিতে পারবে বলে, দুটো চায়ের কাপ, দুটো পিরিচ কিনে রেখেছে সে। দুটো চেয়ার আর একটা গোল টিপয় কিনতে পারলে ভালো হতো। কিন্তু ইচ্ছা থাকলেও উপায় নেই।

মনসুর অবস্থা সম্পন্ন ব্যক্তি। সে সেলিনা, সেলিনার মা এবং মরিয়মকে সঙ্গে নিয়ে নিউ মার্কেটে যায় কেনাকাটা করার জন্য। বুদ্ধিমান মনসুর দু' শিশি সেন্ট কিনে— একটি সেলিনাকে ও অন্যটি মরিয়মকে দিয়েছিল। এমনকি সেলিনার মাকেও কিছু কিনে দিতে উদ্‌গ্রীব হলেও সে নিতে রাজি হয়নি। সাম্য বজায় রাখতে মনসুর যথাসাধ্য চেষ্টা করে।

সাংবাদিক মাহমুদ এর নজর চারিদিকে থাকে। মরিয়ম, ছাত্রী সেলিনা, তার মা ও মনসুর নিউমার্কেট গেলে মাহমুদের দৃষ্টিতে ধরা পড়ে। সে বড়োলোকেদের সঙ্গে অতিরিক্ত দহরম-মহরম পছন্দ করে না। সেখানে সম্পর্ক বজায় রেখে কিছু না বললেও বাড়িতে এসে মরিয়মকে শাসন করে।

> "ওদের মেয়েকে পড়াও আর বিনিময়ে টাকা পাও। নিউমার্কেটে ওদের সঙ্গ দেবার জন্য নিশ্চয় কোন বাড়তি টাকা তোমাকে দেয়া হয় না।"[১৫]

বড়ো ভাইয়ের বড়ো দায়িত্ব থাকে সংসারের সব সদস্যের প্রতি দেখভাল করার। বোন মরিয়মের প্রতি স্বর ঝাঁঝালো হয় এই বলে—

> "কতদিন বলেছি বড়োলোকের বাচ্চাগুলোকে আমি দেখতে পারি না, আর তুমি সঙ্গে হাওয়া খেতে বেরোও?"[১৬]

বড়োলোকদের দেখতে পারে না মাহমুদ। কারণ— তারা সমাজের সব সুযোগ সুবিধা ভোগ করে আরাম-আয়াশে থাকে। আর গরীব মানুষগুলো মাথার ঘাম পায়ে ফেলে পরিশ্রম করে। মাহমুদ তীব্র স্বরে উচ্চারণ করে—

> "কোনো বড়োলোকের ছেলেকে দেখেছো বি.এ. পাশ করে পঁচাত্তর টাকার চাকরির জন্যে মাথা খুঁড়ে মরতে? কই, একটা বড়োলোক দেখাও তো আমায়, যার মেয়ে অন্যের বাড়িতে ছাত্রী পড়িয়ে যে টাকা পায় তা দিয়ে কলেজের বেতন শোধ করে?"[১৭]

মাহমুদ জীবনে পরিশ্রম করে বড়ো হয়েছে। তাই ধনীদের প্রতি তার তাচ্ছিল্য ভাব। এক পর্যায়ে সে বলে—

> "সব শালা বেঈমান, চামার। বিনে পয়সায় মানুষকে খাটিয়ে মারতে চায়।"[১৮]

গরীবদের টাকা ধার বা পরিশোধের ব্যাপারে নেতিবাচক মনোভাব। সেই সময়ের সমাজেও ছিল। 'বিশ্রামাগার' রেস্তোরার মালিক খোদাবক্স, মাহমুদের কাছে পাওনা টাকা চাইলে গলা তিক্ততায় ভরে ওঠে—

> "টাকা শোধ করবো না বলে ভয় হচ্ছে নাকি তোমার? গরিব হতে পারি, নীচ নই, বুঝলে? যা খেয়েছি তা পাই পাই করে শোধ করে দেবো। বেঈমান ভেবো না আমাদের, বেঈমান নই।"[১৯]

খদ্দেরদের চটাতে হয় না— এটা খোদাবক্স খুব ভালো করেই জানে। খদ্দের চটালে ব্যবসার ক্ষতি এটা বুঝে সে মাহমুদকে অন্য প্রসঙ্গে টেনে নিয়ে সেই তার দেওয়া চাকরির ইন্টারভিউয়ের ব্যাপারে সঙ্গে আলাপ চারিতা জমিয়ে দেয়।

মাহমুদের বন্ধু শাহাদাত একটি প্রেস চালাতো। কিন্তু প্রতিযোগিতার বাজারে টিকতে না পেরে সেই ব্যবসা উঠে যায় এবং জীবন-জীবিকার তাগিদে মুদির দোকান খুলতে বাধ্য হয়। প্রেস তুলে দিয়ে মুদি দোকান দেওয়াতে তার মন ভালো নেই কিন্তু করার কিছু নেই। তার আক্ষেপ—

> "কম্পিটিশনের বাজারে ভালো ক্যাপিটাল না থাকলে বিজনেসে টিকে থাকা যায় না।"[২০]

অর্থবল সর্বদা সব যুগে সব সমাজে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে এসেছে। এখানেও তার ব্যতিক্রম ঘটে না।

দরিদ্র মানুষরা কারো সাহায্য সহযোগিতা পেলে তাকে শ্রদ্ধা ও ভক্তিতে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে বসায়। হাসমত আলীর পরিবারে আনাগোনা মনসুরের। দরদি কণ্ঠে হাসমত আলীকে বাবা ও সালেহা বিবিকে মা সম্বোধন করে মন জয় করে নেয় তাদের। হাসিনাকে শাড়ি, দুলুকে প্লাস্টিকের পুতুল, খোকনকে ফুটবল, অসুস্থ মরিয়মকে নানারকম টনিক, ফ্রুটস্ আর হরলিকস্ কিনে দেয় মনসুর। গরীব হাসমত আলীর পরিবার একটু আশার আলো দেখে, মনসুরের প্রদত্ত উপহার সামগ্রীকে পাথেয় করে। ঔপন্যাসিকের ভাষায়—

> "দারিদ্র্য-বিধ্বস্ত পরিবারে খোদার ফেরেস্তা হিসেবে আবির্ভূত হলো মনসুর।"[২১]

মনসুর এর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হাসমত আলী। আসলে প্রাপ্তিযোগ বদান্যতা বহন করে। তাই হাসমত আলীর ভাষায় মনসুর সম্পর্কে ব্যক্ত হয়—

> "আহা বড়ো ভালো ছেলে। জীবনে কত মানুষ দেখলাম, এমন নম্র আর ভদ্র ছেলে আমি দেখিনি।"[২২]

মাহমুদ বরাবরই ধনীর দুলালদের দেখতে পারে না। হাসমত আলীর মনসুর-প্রীতি মাহমুদের মনকে নাড়া দেয়। বড়োলোক ছেলের আগমনকে অশনি সংকেত মনে করে। সে তার মাকে বলে বসে—

> "টাকার জন্যে যে তোমরা আত্ম বিক্রি করছো তা আমি জানি।"[২৩]

হাসিনা বরাবর ঠোঁটকাটা। মাহমুদকে সে ধিক্কার দেয়, আজ পর্যন্ত তাকে সে একটা শাড়ি কিনে দিতে পারলো না, অথচ মুখে বড়ো বড়ো কথা। এতে অপমানিত বোধ করে মাহমুদ। সে একজন পুরুষ হয়েও পাঁচশো টাকা আয় করার মতো সামর্থ কোনদিন তার হবে না। না হওয়ার কারণ ও সে ব্যাখ্যা করেছে এভাবে—

> "হবে না এ জন্য যে তার কোন বড়োলোক হিতৈষী নেই, মন্ত্রী আত্মীয় নেই, অসৎ পথে অর্থ রোজগারের প্রবৃত্তি নেই।"[২৪]

হাসিনার প্রেমিক তসলিম ক্যামেরায় হাসিনাদের পরিবারের সকল সদস্যের গ্রুপ ছবি তুলতে চেয়েছিল। কিন্তু হাসিনার মা সালেহা বিবি ধর্মীয় সংস্কার এর দোহাই দিয়ে ছবি তুলতে অস্বীকৃতি জানায়। যদিও মাহমুদের কড়া মেজাজে সালেহা বিবি ছবি তুলতে বাধ্য হয়।

মনসুর মরিয়মকে বিয়ে করতে চায়। কিন্তু মাহমুদের তাতে মত নেই। কারণ— বড়োলোকদের সে বরাবর বিশ্বাস করে না। তার উক্তি—

> "এদেশে ক'টা লোক আছে যে তার চরিত্র ঠিক রেখে বড়োলোক হতে পেরেছে? অন্যকে ফাঁকি দিয়ে, ধোঁকাবাজ আর লাম্পট্য করে, শোষণ আর দুর্নীতির আশ্রয় নিয়ে টাকা রোজগার করে বড়োলোক হয়েছে সব।"[২৫]

সালেহা বিবি মাহমুদের মতামতকে গুরুত্ব দিতে নারাজ।

মরিয়মের সঙ্গে মনসুরের বিয়ে ঠিক হলে টাকার জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়ে হাসমত আলী। যতই হোক বড়ো মেয়ের বিয়ে। প্রচুর লোককে নিমন্ত্রণ করতে হবে। তার জন্য প্রচুর টাকার প্রয়োজন।

"টাকার চিন্তা বারবার বিভ্রান্ত করছিলো তাঁকে। কেরানির জীবনে সঞ্চয় সম্ভব নয়।"[২৬]

কেরানি হয়ে টাকা জমানোর কথা কোনো কালেই দেখা যায় না। সমাজ বাস্তবতায় এ বাক্যটি চিরন্তন সত্য। বিয়েতে গরিবদের পক্ষে ভোজ খাওয়ানো বেশ কষ্টসাধ্য। যাদের নুন আনতে পান্তা ফুরোয়, তাদের জন্য ভোজ দেওয়া বেশি বাড়াবাড়ির নামান্তর। মাহমুদ তাই তার মাকে বলেছিল—

"খাওয়া-দাওয়ার ঝামেলা না করে, নাস্তা পানি খাইয়ে সকলকে বিদেয় দেবার বন্দোবস্ত করো। গরিবের অত ভোজ খাওয়াবার চিন্তা না করাই ভালো।"[২৭]

চিরকাল গরিবরা শখ-আহ্লাদ বুকে চেপে রেখে দিনযাপন করে।

জামাই বাড়ির অবস্থা ভালো হলে এবং কনে বাড়ির অবস্থা দুর্বল হলে বিয়ের প্রথম প্রথম জামাইরা শ্বশুর বাড়ি অর্থ-কড়ি, জিনিসপত্র দিয়ে সহায়তা করে থাকে। এক্ষেত্রে মনসুরকে মরিয়মদের বাপের বাড়িতে সাহায্য সহযোগিতা করতে দেখা যায়।

মরিয়মের মনসুরের সাথে বিয়ে হওয়ার আগে জাহেদ নামে এক যুবকের সঙ্গে চিটাগাং পালিয়ে গিয়েছিল। মনসুর সে খবর জানতে পারে বিয়ে হওয়ার কয়েক মাস পর। ফলে অশান্তির সূত্রপাত হয়। নিত্যদিন ঝামেলা চলতে থাকে। মরিয়মের বান্ধবী লিলিকে সব কথা খুলে বললে সে মরিয়মকে ধিক্কার দেয়। জীবনের সব ঘটনা খুলে বলতে গেলে কেন? অত সত্যবাদী হতে নেই। সে আরো বলেছিল—

"এ সমাজে বাঁচতে হলে মিথ্যের মুখোশ পরে চলতে হয়।"[২৮]

জীবনে চলার পথ বড়ো বিচিত্র। বেঁচে থাকার জন্য সত্য এড়ানো উচিত ছিল মরিয়মের। মিথ্যার আশ্রয় নেয়নি বলে তাকে ফেরত আসতে হয় বাবার বাড়ি।

কিছু কিছু মানুষ স্বাধীনচেতা হয়। এ উপন্যাসেও দেখা যায় শাহাদাত প্রেস বিক্রি করে স্টেশনারী দোকান দেয়। অন্যের অধীনস্ত হয়ে কাজ করতে তার মন সায় দেয় না। শাহাদাত সম্পর্কে তাই দেখা যায়—

"কারো চাকরি সে করবে না। আমেনা চায় না তার স্বামী কারো গোলামী করুক।"[২৯]

সেই সময় চাকরি করাটাও গোলামির দৃষ্টিতে দেখা— ভাবায় যায় না।

স্বামীর বাড়ি থেকে যেদিন মরিয়ম বাবা-মার বাড়ি ফিরে এসেছিল— সে রাতেই ব্যাপক ঝড় বৃষ্টিতে জীর্ণ বাড়িটা ভেঙে পড়ে। তাতে চাপা পড়ে প্রাণ হারায় মরিয়মের বাবা-মা-ভাই-বোন সকলে, একমাত্র মাহমুদ ছাড়া। রাতে তার ডিউটি থাকায় সে বাড়ির বাইরে ছিল। সব হারিয়ে মাহমুদ পাগল প্রায়। মরিয়মের বান্ধবী লিলির সান্নিধ্যে সে বেঁচে থাকে।

সমাজজীবনের বাস্তবরূপ উপন্যাসে প্রতিভাত হয়। মানুষের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্নার অভিব্যক্তি উপন্যাসে প্রাণ সঞ্চার করে। যা ব্যক্তি, সমাজ, জাতি ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে আলোড়িত হয়। জহির রায়হান 'বরফ গলা নদী' উপন্যাসে জীবনের সংকীর্ণতাকে তুলে ধরেছেন, দেখিয়েছেন সম্ভাবনাকেও। এতে বাঙালি নিম্ন মধ্যবিত্তের জীবন-প্রবাহ কাহিনি বিন্যাস ও চরিত্র চিত্রণের মধ্য দিয়ে বাস্তবসমাজের চিত্র প্রতিভাত হয়েছে।

তথ্যসূত্র :

১. দাশ, শেখর, তারাশঙ্করের উপন্যাসে সমাজচিন্তা, অক্ষর পাবলিকেশনস্, আগরতলা, ত্রিপুরা, প্রথম প্রকাশ, বইমেলা ২০০৫, পৃ. ৯৭
২. বানু, আরজুমন্দ আরা, শহীদুল্লা কায়সার ও জহির রায়হানের কথাসাহিত্য: বিষয় ও প্রকরণ, অনিন্দ্য প্রকাশ, ৬ শ্রীশদাস লেন, ঢাকা- ১১০০, প্রথম প্রকাশ, মার্চ ২০০৮, পৃ. ১৮৯
৩. ঘোষ, বিশ্বজিৎ, বাংলাদেশের সাহিত্য, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯১, পৃ. ২৯

৪. রায়, তাপস, সমাজ বীক্ষণের প্রেক্ষিতে জগদীশ গুপ্তের কথাসাহিত্য, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ৬/২ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০০০৯, প্রথম প্রকাশ, অক্টোবর ২০১৯, পৃ. ৮৬
৫. আজিজ, মো : আব্দুল, আলাউদ্দিন আল আজাদের উপন্যাসে সমাজবাস্তবতা, গতিধারা, ৩৮/২ ক বাংলা বাজার, ঢাকা-১১০০, প্রথম প্রকাশ, ২০১৮, পৃ. ২৬
৬. ইসলাম, আজহার, সাহিত্যে বাস্তবতা, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম পুনর্মুদ্রণ, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৭, পৃ. ১২৩
৭. জহির রায়হানের রচনাবলী (প্রথম খন্ড), ডক্টর আশ্‌রাফ সিদ্দিকী সম্পাদিত, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ৬৬ প্যারীদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা- ১১০০, ষষ্ঠ মুদ্রণ,ফেব্রুয়ারি ২০০৯, পৃ. ২২২
৮. তদেব, পৃ. ২২২
৯. তদেব, পৃ. ২২৫
১০. তদেব, পৃ. ২২৫
১১. তদেব, পৃ. ২৩১
১২. তদেব, পৃ. ২৩৩
১৩. তদেব, পৃ. ২৪০
১৪. তদেব, পৃ. ২৪১
১৫. তদেব, পৃ. ২৪৭
১৬. তদেব, পৃ. ২৪৭
১৭. তদেব, পৃ. ২৪৮
১৮. তদেব, পৃ. ২৪৮
১৯. তদেব, পৃ. ২৫০
২০. তদেব, পৃ. ২৫২
২১. তদেব, পৃ. ২৫৬
২২. তদেব, পৃ. ২৫৬
২৩. তদেব, পৃ. ২৫৮
২৪. তদেব, পৃ. ২৫৯
২৫. তদেব, পৃ. ২৬৫
২৬. তদেব, পৃ. ২৬৬
২৭. তদেব, পৃ. ২৬৬-২৬৭
২৮. তদেব, পৃ. ২৭৮
২৯. তদেব, পৃ. ২৮০